খ্যাপা খুঁজে ফেরে

তপন কর

খ্যাপা খুঁজে ফেরে নদী পথ থেকে মাঠাবুর মাথা
ললাট লিখন

বছর কুড়ি আগের কথা। পুলিয়া জেলার গ্রামে পায়ে হেঁটে ঘুরছি মাটির ঘরের দেওয়ালচিত্র খুঁজতে। গড়জয়পুর থানার পাশ দিয়ে উত্তর দিকে যে চওড়া রাস্তাটা চলে গেছে সেই পথে মাইলখানেক হাঁটার পর এক পল্লীতে পৌছোনো গেল। বেলা তখন বারোটা কি সাড়ে বারোটা। আগের কয়েকটা গ্রাম ঘুরে ঘুরে বেশ ক্লান্ত। তবুও নতুন একটা গ্রাম দেখার টানে হাঁটছি। একটা বাড়ি থেকে বছর নয় দশের একটি ছোট্ট মেয়ে বেরিয়ে এসে আমার আগে আগে চলতে লাগল। সাধারণ চাষিঘরের মেয়ে। ময়লা ফ্রক পরা। মেয়েটিকে ডেকে বললাম, 'অ্যাই খুকি শোনো।' মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। বললাম, 'এদিকে কোনো ঘরের দেওয়ালে ছবি আঁকা আছে?' দেখেছো তুমি? আমার কথা শেষ হওয়ার আগেই থমকে দাঁড়ানো মেয়ে ভয় পেয়ে দিল দৌড়। সোজা সামনের দিকে। আমি জানতাম। গ্রামের দিকে এমন হয়। অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে অনেকেই লজ্জা পায়। ভয়ও পায়।

আরো মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর রাস্তার ধারে পড়ল একটা চায়ের দোকান। দোকানদার বছর পঞ্চাশ বয়সের প্রৌঢ়। উনানে কয়লা দিয়ে হাওয়া করছিলেন, তেলেভাজা হবে। আমি কাঁধের সাইড ব্যাগটা নামিয়ে রেখে পেতে রাখা তক্তায় বসতে বসতে চা আর তেলেভাজার অর্ডার দিলাম। হঠাৎ চোখে পড়ল রাস্তার উল্টো দিকে একটা বেগুনক্ষেতের ওপারে বেড়ার আড়ালে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমাকে দেখছে। বুঝলাম ওর ভয় এখনো কাটেনি। দোকানদারকে বললাম, এমেয়েটা আপনার কেউ হয় নাকি?' উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার মেয়ে, ওই তো ছুটে এসে বলল, বাবা খ্যাপা আসছে।'

কথাটা শোনার মুহূর্তে আমার শরীরে শিহরণ বয়ে গিয়েছিল কি না একদিন পর আজ আর ঠিক বলতে পারব না। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা বড়ো পাথরের চাঁই বসে গিয়েছিল। এক মুহূর্তের জন্যে হেসেছিলাম হয়ত। সে হাসি কেউ দেখেনি। কিন্তু এক ক্ষুদ্র বালিকা সেদিন যে উপাধি দিয়েছিল তা যেমন নিরেট তেমনি অমোঘ। যেন ললাট লিখন।

ততদিনে দেশ পত্রিকায় রঙিন ছবিসহ আমার রচনা প্রকাশিত হয়েছে, 'মানভূমি চিত্রকলা'। বিশিষ্টজনেরা আমার লেখার তারিফ করছেন। বিশেষজ্ঞজন বলছেন, আমিই নাকি প্রথম বললাম যে, সাঁওতালরা ছাড়াও সাধারণ নিম্নবর্গের বহু মানুষ এবং মাহাতো, ভূমিজরাও অনেক দেওয়ালচিত্র আঁকেন। সেই আমাকে একটা দশ বশরের বালিকা চিহ্নিত করল 'ক্ষ্যাপা' বলে, হায়! হয়ত এটাই ছিল ভবিতব্য। কারণ এর কার্যকারণ শু হয়েছিল আরো অনেক আগে। ল্যান্সডাউন রোডের 'মানস সরোবর' বিল্ডিংয়ের ছয় কি সাত তলার উপর বোস কোম্পানির আর্কিটেক্টদের সঙ্গে কাজ করছিলাম বালিগঞ্জের বিড়লা মন্দিরে লাগানো হবে, এমন ভাস্কর্যের ড্রয়িং নিয়ে। সারা ভারতবর্ষের মঠমন্দিরের ভাস্কর্যের ফোটোগ্রাফ আমার টেবিলে গাদা করা হয়েছে সেই সব ছবি স্টাডি করা আর্ট কলেজ পাশ করা আর্টিস্ট, আবার রামায়ণ মহাভারত পড়া, পুরাণ পড়া লেখক। এসব বলে আমার শুভার্থী বন্ধুরা ধরে নিয়ে গিয়ে এক বাতানুকূল কক্ষে আমাকে বন্দী করে

দিয়েছিল মোটা মাইনের লোভ দেখিয়ে।

নদী কোন্ পথে

কিন্তু ভবিতব্য খণ্ডাবে কে? খবর পেলাম রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফাইন কোর্সে ভর্তির জন্য আমি নির্বাচিত হয়েছি। পয়ষট্টি জন্য প্রতিযোগীর সঙ্গে নির্বাচনী পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় স্থান পেয়েছি। ভাবলাম চাকরি পরে করা যাবে, অগে শিক্ষ াগত যোগ্যতা বাড়ানো যাক। বোস কোম্পানির দিকে আর না গিয়ে রবীন্দ্রভারতীর ক্লাসে যেতে লাগলাম। চার মাস যাব ার পর রবীন্দ্রভারতী এম. ফাইন ছেড়ে দিলাম। ছবি আঁকা শু হল। কিন্তু খালি পেটে তো ছবি আঁকা যায় না। প্রস্তরযুগের শিল্পী সম্বর হরিণের মাংস সেঁকে খেয়ে গুহার দেওয়ালে ছবি এঁকেছেন, আমার তো অন্তত ফেনাভাত চাই। বাড়িতে রাগ ারাগি করে বাড়ি যাই না। প্রফুল্লচন্দ্র রোডের ছোট্ট কুঠুরিতে একা থাকি। তাই দু- চারটে নগদ পয়সার কাজ পেতে কলেজ স্ট্রিটে ঘুরে পুস্তক বিপণির অনুপ মাহিন্দারের কাছে বসি। সেখানেই পাকড়াও করল বিমল পাল। ধরে নিয়ে গেল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগের এক কক্ষে। সাক্ষাৎ হল অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। অ াঞ্চলিক ভাষা গবেষণা প্রকল্পের ফিল্ড ইনভেস্টিগেটারের পদে আমাকে লাগানো হল। এর আগে বি . এ . পাশ করেছি প্র াইভেটে পরীক্ষা দিয়ে। সেটা জানতে পেরেই এঁরা আমাকে ধরেছেন। এঁদের একজন শিক্ষিত অর্থাৎ প্রথাগত বিদ্যালয় শিক্ষায় শিক্ষিত শিল্পীর প্রয়োজন ছিল। যেসব বস্তুর ফোটো সম্ভব হয় না, আঁকতে হয়, আমাকে সেইসব বস্তু দেখে এঁকে দিতে হবে। সেই সঙ্গে শব্দ সংগ্রহের কাজও করতে হবে। কাজটা ভালো লাগল। আক র্ষণ যেটা ছিল তা হল ভ্রমণ। পশ্চি মবঙ্গের গ্রামে গ্রামে ঘোরা যাবে সরকারি পয়সায়। নগদ তিনশ টাকা দেবেন, আর কি চাই। প্রথম ভ্রমণ হল বলঁগা। দাণ লাগল।

ঘুঁটে কয় প্রকার

বলগাঁতেই এক সন্ধ্যায় একটি মাটির ঘরের দালানে বসে সেই বাড়ির লোকেদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, ঘুঁটে সর্বদা ঘুঁটের মতো হয় না।

দুই সন্তানের জননী কেরোসিনের লম্পর আলোয় রান্না করছেন। অ্যালুমিনিয়ামের হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। স্বামী দেওয় ালে হেলান দিয়ে বসে আমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। চার-পাঁচ বছরের বড়োটি বাপের পাশে বসে, দুবছরের ছোটোটি ব াপের কোলে। আমার শব্দ লেখার যাতে সুবিধা হয় সেজন্যে লম্পটি আমার সামনে। স্টিলের ক্লিপ আঁটা ম্যাসোনাইট বোর্ডের উপর কাগজ রেখে শুনে শব্দ লিখছি। বউটি মাঝে মাঝে উনানে জ্বালানি ঠেলে দিচ্ছে। হঠাৎই চোখে পড়ল উন ানের আগুনে ঠেলে দেওয়া লম্বা লম্বা গাছের ডালের মতো বস্তু গুলি গাছের ডাল নয়। ওগুলো সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করায় বউটি বলল 'ঘোষি'। ঘোষি কি? বললাম, 'কে করেছে এমন, কেন করেছে?' আমার প্রশ্ন থেকে বউটি বুঝতে পারল আগে আমি ঘোষি দেখিনি। সে উঠে পড়ে আমাকে ডাকল, বলল, 'এদিকে এসো।' লম্ফটি তুলে নিয়ে দাওয়া থেকে নেমে ঘরের পাশের দিকে নিয়ে চলল। ধারীর গায়ে সার সার দাঁড় করানো 'ঘোষি'। শুধু এরা নয়, সবাই করে। গোবরের বিস্কিটের বদলে স্টিক্।

ঘাসের পাখা

বলগাঁয় থাকতে থাকতেই আটাত্তরের বিখ্যাত বন্যা। যে বন্যায় বাংলার গ্রামের সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা শহরও ডুবছিল। কুলগাছির বাড়ি দিয়ে দেখলাম বাড়িতে কেউ নেই। জলের ভয়ে বাড়ির লোক আগেই নিরাপদ আশ্রয় চলে গেছে।
প্রায় মাসখানেক লাগল বন্যার জল নামতে এবং কর্মস্থলে ফিরতে। ফিরে জানলাম যদিও ট্রেন চলছে না তবু বাসযোগে অ ামরা যাচ্ছি উত্তরবঙ্গে।

দার্জিলিং-এর কথা মনে পড়লেই মনে পড়ে রাজবংশী মেয়ে আলো রায়-এর কথা। সে আমাকে দুটো ঘাসের পাখা

দিয়েছিল। তখন তার বয়স কত ছিল, আঠারো হয়ত। আমার বাইশ কি তেইশ। কলকাতায় আমার বাড়ি শুনে কেমন করে চেয়েছিল আমার মুখের দিকে। অনেকটা সন্ধ্যা রায়ের মত দেখতে। ফর্সা। পরের দিকে আর আমার চোখে তাক ায়নি। মুখ নিচু করেই বলেছিল, 'আবার আসবেন তো?' হ্যাঁ বলা সহজ ছিল না। ইউনিভার্সিটি মাস গেলে তিনশ টাকা দেয়। চা সিগারেটের নেশা আছে। কবে কোথায় বুক কভারের একটা ডিজাইন করে পঞ্চাশটা টাকা পাব, তার উপর ভরসা করে এই এত দূরদেশের একটা এমন সুন্দরী মেয়েকে আবার আসব বলা যায়?

না আসব না, একথা কেউ বলে নাকি? তাই কোন উত্তর না দিয়েই ঘাসের বোনা পাখা দুটো নিয়ে মাথা নিচু করে উঠে পড়লাম। পিছু ফিরে দেখলাম সেও মাখা নিচু করেই বসে আছে তখনো। হয়তো তার চোখে জল ছিল, তাই মুখ তুলতে পারছিল না। আমি আর কী করতে পারি, পাখা দুটো অন্য আরো কিছু পাখার সঙ্গে মিশিয়ে কাগজে মুড়ে তুলে রেখেছি ঘরের মাচায়। পঁচিশ বছর কেটে গেলেও ফেলিনি। ফেলব কেন? একে তো আলো রায়ের স্মৃতি, তার মুখ মনে করায়। অমন পাখা তো আর অন্য কোথাও দেখিনি। উত্তরবঙ্গের ভুল্‌কি ঘাসের পাখা পঞ্চির কিংবা বাঁশের চিয়াড়ি তুলে যে হ াতপাখা হয় তারই সমগোত্রীয়। পরে গোটা পশ্চিমবঙ্গ কত মেয়ে কত পাখা দেখিয়েছে, তা আর গুণে বলা যাবে না। বেশিরভাগই কিশোরী তেরো চৌদ্দ কি পনেরো ষোল সব বয়স। তারা ছুটে ছুটে গিয়ে তাদের ঘরের তাকে তুলে রাখা প াখা এনে আমাকে দেখিয়েছে। রঙিন সুতোর বোনা পাখা, উলের বোনা পাখা, নাইলন পাতির বোনা পাখা, তালপাতার বোনা পাখা, কত তাদের বিচিত্র রঙের কারিকুরি, হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে হাওয়া খাওয়ার যে কৌশল তাতেও কত সব সাদাম াটা বাহাদুরি এই সে তাদের হাতের কাজ, তা নিয়ে তাদের কত ভালবাসা।

সুন্দরবন

মানুষ যেমন সুখের কথা ভাবতে ভাবতে দুঃখের কথা মনে করে ফেলে, আমারও তেমনি উত্তরের কথা ভাবতে বসলেই দক্ষিণের কথা মনে পড়ে যায়। দক্ষিণে আছে সুন্দরবন। খুব ছোটো বেলায় যখন সুন্দরবনের শিকারকাহিনী পড়তুম তখন যেসব দৃশ্য টোখের সামনে ভেসে উঠত বড় হয়ে সুন্দরবন গিয়ে তেমন দৃশ্য খুঁজে পাইনি। বরং মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পুলিয়ায় তেমন কিছু গাছপালা বা জঙ্গল দেখেছি। সুন্দরবনে যে সুন্দরী গাছের জঙ্গল সেটা একেবারে বাজে জিনিস। ম ানুষের বেড়াবার পক্ষে সেটা মোটেই সুখকর নয়।

ডায়মন্ডহারবারের এস. ডি. পি. ও রচপাল সিং আমাদের পুরো একটা লঞ্চ দিয়ে দিলেন সুন্দরবন চষে বেড়াবার জন্যে। লঞ্চে তোলা হল তিন দিনের রসদ। ছেলেমেয়ে মিলিয়ে আমরা প্রায় বারো জন। সঙ্গে লঞ্চের কর্মীবৃন্দ ও জনা দুই ছদ্মবেশী পুলিশ। পাথরপ্রতিমা নামটা আগে থেকেই শোনা ছিল। ওহে লঞ্চ, চল তো পাথরপ্রতিমায়। এই জল-জঙ্গলে প াথর কোথা থেকে এল আর প্রতিমাই বা কে বানাল দেখে আসি গিয়ে। আর মাতলা নদী। নদী এমন শান্ত, অথচ নাম ম াতলা। কেন কে জানে?

পাথরপ্রতিমা, মরিচঝাঁপি চর এমনি সব গ্রামে নামছি। মানুষজন আমাদের দেখে অবাক হচ্ছেন। আমাদের কাজকর্ম দেখে বা আমাদের প্রাবলি শুনে বিস্মিত হচ্ছেন। মানুষ আবার এইসব করে নাকি? হায় ভগবান, কোথায় সুন্দরবন কোথায় রয়েল বেঙ্গল টাইগার? সুন্দরবনে যে মধুশিকারিরা মৌচাক ভাঙতে আসে সেসব মৌচাকই বা কোথায়? এ তো শুধু ম াঝারি সাইজের সুন্দরী আর গরান গাছের জঙ্গল। জোয়ারে যার অনেকটাই ডুবে যায়। আর যেসব গ্রাম বা বসতি প াওয়া যাচ্ছে এসবই তো মেদিনীপুরের লোক ভর্তি। এদের ভাষা সংস্কৃতি সবই মেদিনীপুরের। সুন্দরবনের সুন্দরী জাতের মানুষ নেই, সুন্দরী ভাষা নেই, সুন্দরী সংস্কৃতি নেই, আর আদতে কোন সুন্দরীও নেই কারণ, কথাটা তো 'সুন্দরী' নয়, কথ াটা হল 'সুঁদরি'। সঁদরির উচচারণ অর্ধ শিক্ষিতের বা ইংরিজি পালিশ-ওয়ালা লোকের কলমে হয়েছে 'সুন্দরী'।

তাই আমাদের প্রধান ডঃ রত্নের ভট্টাচার্যকে বললাম, 'রতনদা, সোঁদরবনে কেঁদো বাঘ না দেখাতে পারেন, কমপক্ষে দু-

একটা কুমির দেখান।' রতনদা বললেন, 'কুমির দেখাতে পারি, তবে ন্যাচারাল হবে না, রিয়ালিস্টিক হবে।' শুনে আমি তো হতভম্ব। কুমিরের এই সব ইজ্‌ম কবে থেকে হল? রতনদা হললেন, 'প্রোজেক্ট আছে, রিয়ালিস্টিক পদ্ধতিতে কুমিরের প্রজনন হচ্ছে, অর্থাৎ কুমিরের চাষ করা হচ্ছে, যেমন লিট্‌ল ম্যাগাজিনগুলো কবির চাষ করে।'

এর মধ্যে বুড়োবুড়ির চরে একটা মন্দিরের ধ্বংসস্তুপ দেখে থমকে গিয়েছিলাম। মন্দিরটা নেই মেঝের স্তর পর্যন্ত ভিতটা আছে। গর্ভগৃহের জায়গায় একটা পাথরের শিবলিঙ্গও আছে। আঁটের কাছে গিয়ে চোখ দিয়ে যা দেখলাম তাতে মনে হতে পারে দু-আড়াইশো বছর আগের মন্দির, প্রশ্ন জাগে, তখন, এই দ্বীপে, এই সুদূর গহীন অঞ্চলে কারা বাস করত, কেন কতদিন ছিল? বুড়োবুড়ি কে? এইসব প্রশ্ন নিয়ে সমবেত মানুষের অবাক দৃষ্টির সামনে থেকে নিজেকে গুটিয়ে আনতে হয়। ইতিহাস দেখলাম রাতে। সেদিনটা ছিল চাঁদের রাত। প্রগাঢ় জ্যোৎস্না। লঞ্চের ছাদ থেকে সকলেই সুন্দরবনের জ্যোৎস্না বিধৌত দিগন্ত বিস্তৃত দুগ্ধশ্বেতশুভ্র জঙ্গলা ঝিলিমিলি দেখে মুগ্ধ হল। নদীর জলে চাঁদের আলোয় কুচিগুলো নতুন পয়সার মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে নাচানাচি করছে। ডাঙার বাঘ কিংবা জলের ডাকাতের ভয় আমাদের ছিল না, তবুও রাত্রে বেশ প্রশস্ত নদীর মাঝখানে গিয়ে আমাদের লঞ্চ নোঙর করত। ফলে প্রকৃতি ছিল আমাদের চোখের সামনে মেলা।

গভীর রাতে ভাবলাম আর একবার দেখব। চুপিচুপি বিছানা ছেড়ে উঠে গেলাম ছাদে। সন্ধ্যায় তবুও দুরের কোনো নৌকায় ছিল কেরোসিনের আলো। এখন সেসব কিছুই নেই, নিছিদ্র জ্যোৎস্না। নির্ভেজাল প্রকৃতি। মনে হচ্ছে এইটাই পৃথিবী। আর এই পৃথিবীতে এই মুহূর্তে আমি ছাড়া আর কেউ নেই। এই জল এই জঙ্গল এই চাঁদ সব আমার। এই জ্যোৎস্নামাখা পৃথিবী আমার। অত সোজা! রতনদা এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। আস্তে বললেন, 'কী দেখছ?' বললাম, কী বিরাট লসের কাণ্ড। উনি বুঝতে না পেরে বললেন, 'কীসের লস্‌?' হাত বাড়িয়ে দেখিয়ে বললাম, 'আজ না হয় আমরা দুজন দেখছি, কিন্তু যখন কেউ কিছু দেখে না, তখনও এই জ্যোৎস্না, এই সৌন্দর্য এখানে হয়ে থাকে --- কেউ দেখে না। শুধু হয়ে থাকে। লস নয়?'

ভিখারির গান

ভিখারিদের গান ছোটোবেলা থেকে শুনে আসছি। আমাদের গ্রামের বাড়িতে মূল ঘর দালান থেকে সদর দরজাটা ছিল অন্তত পঞ্চাশ-ষাট ফুট দূরে, মাঝখানে ছিল পাকা উঠান। হঠাৎ টুং টুং করে কর্তাল বেজে উঠত, আর তার সঙ্গে গুনগুন করে কী সব গাইত। আমরা কথা শুনতাম না। কথার মানেও সে বয়সে মগজে ঢুকত না। সুরটা কানে লেগে থাকত। আমাদের কাজ ভিখারি এলেই তাকে ভিক্ষা দেওয়া। মাটির কলসি থেকে এক মুঠো চাল পিতলের রেকাবিতে নিয়ে ভিখাবির ঝোলায় ঢেলে দেওয়া। গান শেষ করে তারা ভিক্ষা নিত। আমরা চালের রেকাবি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। মেয়ে ভিখারিরা খুব একটা গান গাইত না। একমাত্র গায়িকা ভিখারি ছিল একজন বোষ্টুমি, বিধবা, সে প্রথম প্রথম গান গাইত মনে আছে। পরের দিকে দেখেছি গান গাওয়ার চেয়ে আমাদের বাড়ির বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে বেশি গল্প করত। শেষকালে যাওয়ার আগে এক আধটা গান শুনিয়ে যেত।

তা সেই যে শৈশবে শোনা ভিখারির গান, সেই গানের সুর একদিন ভেসে এল অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায়, ফরেস্ট বাংলোর উঠোনে, গ্রীষ্মের তপ্ত বিকালের পড়ন্ত দিনে। সেই কর্তালের টুং টুং ধ্বনি, সেই আপন মনে গেয়ে যাওয়া গুনগুন গীতি। কে গায়? সাদা ধুতি সাদা গেঞ্জি পরা বছর চল্লিশের গৌরবর্ণ কেউ একজন। এখানে এই পাহাড়ের মাথায় জঙ্গলে কজনই বা বাস করে, তারা কতই বা ভিক্ষা দেবে, ওর চলবে কী করে? ও কেন এই শেষ বেলায় সন্ধ্যার মুখে এমন নির্জন অরণ্যে একাকী গাইছে? ও কী গানই বা গাইছে? ডাকো তো ওকে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসের ছ-জন ছাত্র, সাত-জন ছাত্রী অযোধ্যা পাহাড়ে এসেছেন গবেষণা কার্যে। আমি তখন পুলিয়া জিলা স্কুল থাকার সুবাদে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপকের দায়িত্বে ওদের সঙ্গেই আছি। অনেকবেলা পর্যন্ত গ্রাম

সমীক্ষার কাজ হয়েছে। ফিরে স্নান খাওয়া সারতে আরও বেলা হয়েছে। ফলে দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রা অপরা গড়িয়ে সন্ধ্যার মুখে। সমস্ত প্রকৃতি আসন্ন সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক নির্মল নির্জনতায় মগ্ন। বড়ো বড়ো গাছেরাও শান্ত সমাহিত। আমরাও কথা বলার চেয়ে বনের নির্জনতাটাই বেশি উপভোগ করছি। এমন সময় দূর থেকে ভেসে এল টুং । তার সঙ্গে এক টানা অন্তর্মগ্ন সুর। গায়ক পথ দিয়ে চলে যাচ্ছিল। তাকে ডাকা হল। সিমেন্ট বাঁধানো দালানে বসে গায়ক নতুন একটি পদ ধরলেন, একই সুর। একই গায়কি। চড়া থেকে ধীরে ধীরে খাদে নেমে যায় আবার আস্তে আস্তে চড়ায় ওঠে। এক তালে বেজে চলে কর্তাল। মৃদু কণ্ঠ, মিষ্ট কণ্ঠ সুমিষ্ট তার সুর। ভাষায় ও গড়নে পদাবলি হলেও উচ্চারণে মানভূমি, তার সুরে গীতি। ঝুমের কীর্তন মিশে এক অদ্ভুত ঘরানা। ভাগ্যিস ক্যাসেট হয়নি। যেমন ক্যাসেট হয়নি কেতিকার সীমা বৌদির বাড়িতে মাঝে মাঝে আসা সেই ওস্তাদজির গানের। সীমা বৌদি নিজে গান করেন। স্বামী পুলিয়া জে. কে. কলেজের বাংলার অধ্যাপক। উদার মানুষ। দুই মেয়ে এক ছেলে নিয়ে সংসার। দোতলায়। নীচের তলায় আমার সংসার। শ্যামবর্ণ ধুতি, রঙিন পাঞ্জাবি একটা জ্যাকেট, কাঁচাপাকা চুল, এলোমেলো অবস্থা, ধীর পায়ে, হেঁটে হেঁটে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে একজন উপরে উঠতেন। সাধারণত তিনি সকালেই আসতেন। মেঝেতে শতরঞ্চি পেতে বসতেন। সারাদিন থাকতেন। যখন তখন আপন মনে গাইতেন। বেশি কথা বলতেন না। হাসতেনও কম শুধু চেয়ে চেয়ে দেখতেন। কথা যা হত বৌদির সঙ্গেই বেশি। বৌদিকে যখন জানতে চাইলাম, উনি কে, কোথায় বাড়ি। তখন জানলাম, উনি ওস্তাদজি, সব বিষয় আশয় জলাঞ্জলি দিয়ে গান নিয়েই থাকেন। একদিন দুটো ফোটো তুলেছিলাম ওস্তাদজির। কাছে আছে। নাম জানি না। সীমা বৌদি নিশ্চয় জানেন। তেমনি একজন জলপাইগুড়ির শিল্পী বীরেন রায়, অন্ধ। ওরা অর্থাৎ উত্তরবঙ্গের শিল্পীরা বেশিরভাগই দোতারা বাজির গান করেন। গান গেয়ে চলেন। অনেক সময় মানুষ শোনে; অনেক সময় কেউই শোনে না। শোনে না আবার, গাছপালারা শোনে। মাঠ ঘাট প্রান্তরের আকাশ বাতাস শোনে। তাই তো ওইসব গায়ক বাউলের মতো। কে শুনছে না শুনছে দেখে না। অন্তরে গান বেজে উঠলে গাইতে শু করে দেন। এরকম একজন বংশীবাদের ফোটো আছে আমার কাছে। বৃদ্ধ, অন্তত ষাট-বাষট্টি বয়স হবে। দুবেলা খেতে পায় কি না ঠিক নেই। রোগা প্যাঁকাটির মতো চোহারা। গাল ভরকা গোঁফ দাড়ি। ছেড়া জামা কাপড়। ছৌ নাচের আসরে ঝুমুরের সঙ্গে তিনি বাঁশি বাজাবেন, কেউ তাঁকে ডাকেনি। পথচলতি বংশীবাদক। নাচগানের আসর দেখে এসে বসে গেছেন। শরীরে খুব একটা শক্তি নেই। তাই বেশিক্ষণ দাড়িয়ে থাকতে পারেন না। মাটিতে বসে বসেই বাঁশের বাঁশি নিয়ে ঝুমুরের সঙ্গে বাজাতে লেগেছেন। প্রচণ্ড ভিড়। চারদিকে থাকা লোকেরা ঠেলাঠেলি করছে। অনেকেই বৃদ্ধের ঘাড়ে পড়ছে, তাদের পা লাগছে গায়ে, কিন্তু সে সবে ভ্রুক্ষেপ নেই। সমস্ত ইন্দ্রিয় জুড়ে আছে ঝুমুর। উবু হয়ে বসে তার সঙ্গে বাঁশির সুর মেলাতেই ব্যস্ত তিনি।

আঞ্চলিক ভাষায় যাত্রা

সেদিন সন্ধ্যাতেও মন্দিরে পঙ্‌ক্তিভোজ। ফলাহার। রাতে যাত্রা। আসা অবধি আমাকে বলা হচ্ছিল যে, রাতে অপেরা পার্টির যাত্রা আছে। রাত প্রায় বারোটা নাগাদ যাত্রা শু হল। অপেরা পার্টি মানে শুধু কলকাতার চিৎপুরের অপেরাগুলিকেই বুঝত। সেদিন দেখলাম গ্রামের লোক আঞ্চলিক বাণিজ্যিক যাত্রাদলগুলিকেও সমান গুত্বের সঙ্গেই অপেরা পার্টির মর্যাদা দিয়ে থাকেন। উপভোগও করেন। অভিনেতাদের ভাষায় আঞ্চলিক শব্দের প্রয়োগ আর স্বাভাবিক উচ্চারণই হয়ত তাঁদের মনোযোগের কারণ, যা হয়ত কলকাতার অপেরায় ততটা পান না।

তবে গ্রামে যাত্রাভিনয়ের পুরোপুরি স্বাদ পেতে হলে গ্রামের অ্যামেচার দলের অভিনয় দেখাই প্রশস্ত। সেই সুযোগ হয়েছিল পুলিয়া জিলা স্কুলের পিওন সুধীর প্রামাণিকের সৌজন্যে। সুধীর সেদিন স্কুলে আসেনি। শহর থেকে পনের ষোলো কিলোমিটার দূরে সুধীরের গ্রাম। তাকে কথা দিয়েছিলাম, যাব তাদের যাত্রা দেখতে। বিকেলে স্কুল ছুটির পর বাস যোগে পৌঁছনো গেল সেই গ্রামে। বাস থেকে নেমে হাঁটতে হয়েছিল মাইল দুই মেঠো পথ। সারারাত জেগে যাত্রাভিনয় দেখা। অভিজ্ঞতা হয়েছিল দ্রৌপদীর চরিত্রে অভিনেতা - ছেলেটির প্রচেষ্টা দেখে। স্ত্রী-চরিত্রে অভিনয় তো করলই, তার সঙ্গে নাচও দেখাল। আমার সংগ্রহে এল তার নৃত্যশীল পা থেকে খুলে আসা একটি ঘুঙুর। স্টেজের উপরেই বাদ্যকারদের পাশে আমার বসার ব্যবস্থা থাকায় ঘুঙুরটি কুড়িয়ে পকেটে পুরতে কোন অসুবিধা হয়নি। তবে খুব কণ দৃশ্য আম

ার জন্যে অপেক্ষা করছিল সকালে ফেরারপথে। সুধীরের কাছ থেকে যথারীতি বিদায় নিয়ে সেই মেঠো পথে যখন ফিরছি, তখনই অন্য একটি আলপথে আমার সামনে এসে পড়ল দ্রৌপদীর চরিত্রাভিনেতা সেই বছর বাইশের শ্যামবর্ণ ছেলেটি। তখন তার পরনে একটা ময়লা পায়জামা, গায়ে পুরনো একটা হাওয়াই শার্ট। মুখের পেন্ট তুলে ফেললেও চোখের ক াজলের রেখা পুরোপুরি মোছেনি। সে আমাকে দেখে মিষ্টি হাসল। তার মাথায় তখন বিশাল একটা মুড়ির বস্তা, অন্তত পঁচিশ কেজি ওজন হবে। সেই বস্তা নিয়ে রাতের দ্রৌপদী প্রভাতে মলিন বদনে শহরমুখী। বাস স্টপেজে এসে সে আমার থেকে একটু তফাতেই দাঁড়াল। বাস এলে অন্যদের সাহায্যে মুড়ির বস্তা নিয়ে সে বাসের ছাদে উঠে গেল। পুলিয়ায় নেমেও আমি আর তার মুখো মুখি হতে চাইনি কারণ বুঝতে পারছিলাম একজন দর্শকের কাছে একজন শিল্পীর পরিচয়ট াই বাঁধিয়ে রাখতে চায়। মুড়ি ব্যাপারির পরিচয় প্রকাশ পেতে সে লজ্জাই পাচ্ছিল।

ঘরের বউ বাইরের বউ

বিভূতি মাহাতোর সঙ্গে আলাপ হল ভোর রাতে আসর ভাঙার পর, বাড়ি ফেরার পথে। সঙ্গে দুতিনজন সঙ্গী, কারো কাঁ ধে পুঁটুলি, কারো কাঁধে খোল, মাদল। বিভূতির কাঁধে হারমোনিয়াম। আর সঙ্গে আছে বিন্দু। বিভুতির নাচনি। ঝালদায় অজিত মাহাতোর উদ্যোগে বসেছিল সারারাতব্যাপী বিরাট নাচনি নাচের আসর। প্রবীণা নবীনা মিলিয়ে সাত আটজন ন াচনির নাচ হল সে রাতে। পনেরো-ষোলো হাজার লোক একত্রে বসে সারা রাত উপভোগ করলেন নাচনির রস। সে রসের এমনই মাদকতা যে আমার তোলা একরোল ফিল্মই হারিয়ে গেল।

ওঁদের সঙ্গে বাস রাস্তার দিকে চলতে চলতেই কথা হল। পরিচয় হল। ঠিকানা দেওয়া নেওয়া হল। প্রস্তাব দিলাম একটি সাক্ষাৎকারের। হুঁ আইসব্যান ঘরকে, কথা হব্যাক।

সেই সূত্রেই এক ছুটির দিনে সকাল সকাল খেয়ে নিয়ে সাইকেলের প্যাডেলে চাপ দিলাম। গন্তব্য গোলাম গ্রাম। বড়ো র াস্তার মাইল স্টোন দেখে দেখে এগোচ্ছিলাম। কিন্তু একসময় বড়ো রাস্তা ছেড়ে টাঁড়ের উপর দিয়ে পায়ে চলা পথ অনুসরণ করতে হল। সবসুদ্ধ চৌদ্দ কিলোমিটার পথ পেরিয়ে চলা।

ওই উৎরাই সাইকেল টানতে টানতে ভেঙে পৌছলাম অভীষ্ট গ্রামের সীমানায়। বেলা তখন প্রায় একটা। লোকজনেদের জিজ্ঞাসা করে করে গিয়ে পৌঁছলাম বিভূতির বাড়ির সদর দরজায়। নাম ধরে ডাক দিলাম। কোনো সাড়া নেই। খোলা দরজা দিয়ে ভিতর দিকে চোখ পড়ল। ছোট্ট উঠানের ওপারে একটা ঘরের দাওয়ায় একটি বউ। শাড়ি পরা, মাথায় ঘে ামটা টানা বউ। ঘোমটা থাকলেও মুখ দেখা যাচ্ছে। মাঝারি রঙের মিষ্টি মুখ। বছর কুড়ি-বাইশ বয়স হবে তার। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই হেসে ডাকল, 'এসো'। মনে হল, আমি আসব ও জানত। যেন আমারই অপেক্ষায় ছিল। এটা হওয়ার কথা নয়। কারণ আমি কোনো খবর দিয়ে আসিনি। তবুও ও ডাকল যখন, তার এতই আন্তরিক ডাক যে আমি স াইকেল ঠেলে উঠোনে ঢুকে পড়লাম। একটা খাটিয়া দাঁড় করানো ছিল, সেটা পেতে দিয়ে বলল, বোসো। বসলাম। বউটি একটা পেতলের ঘটিতে খাবার জল এলে দিল। দিয়েই আবার ওর নিজের কাজে বসে গেল। সেখানেই, মেঝেতে উঁচু হয়ে বসে একটা থালায় পাকা বেগুনের বীজ বের করতে লাগল। পরে কখনো বেগুনচারা চৈরি হবে। বউটিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'বিভুতি তোমার কে হয়?' সে বলল যে, তার স্বামী হয়। জিজ্ঞেস করে আরো জানা গেল মাত্র বছর খ ানের আগে তার বিয়ে হয়েছে বিভূতির সঙ্গে। জানতে চাইলাম, 'বিন্দু অর্থাৎ বিভূতির নাচনি কি তোমার বিয়ের আগে থেকেই আছে?' সে শুধু বলল, 'হুঁ।'

----- কোন ঘরটায় থাকে বিন্দু?

হাত তুলে দেখাল উঠোনের উল্টোদিকের একটা চালা ঘরের দিকে।

----- ওখানেই নাচগানের রিহার্সাল হয়।

----- হুঁ।

----- তা বিন্দু বিভূতির সঙ্গে কত বছর আছে?

----- পাঁচ-ছ বছর হবে।
----- এখন বিভূতি কোথায়? বাড়িতে নেই?
----- ন, ঘরকে নাই। নাচ করতে গেছে।
----- কোথায়?
উত্তর একটা গ্রামের নাম বলল। যা কোথায় কতদূর আমি জানি না। জিজ্ঞেস করলাম, 'কবে ফিরবে?'
----- কবে ফিরে; কে জানে। আসর থেকে আবার কত লক ডাক্যে নিয়ে যায়। ফিরার ঠিক নাই।

বুঝলাম এক আসর থেকে আরেকটা আসরের ডাক পড়ে অনেক সময়ই। মাঝে সময় না থাকলে বাড়ি ফেরা হয় না। সদলে রওনা হতে হয় পরের আসরের উদ্দেশে। অতএব বিভূতি এখন বাড়ি নেই, কবে ফিরবে তারও ঠিক ঠিকানা নাই। তখন জিজ্ঞেস করলাম, তা বাড়িতে এখন আর কে আছেন?

---- শাশুড়ি আছে।
---- কই, তাকে তো দেখছি না।
---- বাঁধে গেছে। থালা-বাসন ধুতে।

একটু অবাক হলাম। স্বামী বাড়িতে নেই, শাশুড়ি গেছে পুকুরঘাটে, এই বউটি একা একজন অচেনা লোককে খাটিয়া পেতে বসিয়ে গল্প করছে। এটা কী ধরনের আচরণ? জিজ্ঞেস করলাম, তুমি আমাকে চেন?' উত্তরে মাথা নেড়ে না বলল। জিজ্ঞেস করল, 'ঘর কোথায়?'

বললাম, পুলিয়ায়। টাউনে।

----- হেথা এসেছ কেন?
----- বিভূতির সঙ্গে গল্প করব বলে এসেছিলুম, তা সে তো নেই। তবে তোমার সঙ্গে গল্প করেও ভাল লাগল। এখন চলি। পরে আবার কখনো আসব। বিভূতিকে বলবে আমার কথা। তার সঙ্গে চিনা হয়েছে ঝালদায়। জিলা ইস্কুলে মাস্টার, বললেই হবে।

উঠে পড়েছি, এমন সময় উঠানে প্রবেশ করলেন এক যুবক। প্যান্ট-শার্ট পরা, গালে দাড়ি। বয়স পঁয়ত্রিশ আন্দাজ। জিজ্ঞেস করলেন, আমি কে, কী চাই উত্যাদি। যথা সম্ভব সরল ভাষায় আসার উদ্দেশ্য জানালাম। তিনি বললেন, আপনি আমার সঙ্গে আসুন, আমি সব বলছি। যুবকের কণ্ঠে একটু খবরদারির গন্ধ পেলাম। তবুও তাঁর কথামত তাঁর পশ্চাদনুসরণ করলাম। প্রায় সব গ্রামেই এরকম স্বনিয়োজিত অভিভাবক দু-একজন করে থাকেন। ইনিও তাঁদের একজন বলে মনে হল। কিন্তু আমি তো এঁর সাক্ষাৎকার নিতে আসিনি, তবে আর এঁর অনুগমন করে কী লাভ, এই কথা ভাবছি এবং নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেব ভাবছি, তখনই মনে হল লোকটি কে? জিজ্ঞাসা করে জানা গেল লোকটি বিভূতির জ্ঞাতি ভ্রাতা এবং একজন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক। এই শিক্ষকতার সুবাদে তিনি একজন ছোটোখাটো নেতা। সেই অধিকারেই তিনি আমাকে অন্য একজনের বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে কথা বলার আহ্বান জানাতে পারেন। তবে কথায় আছে, যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখিবে ভাই . . . তাই এই গ্রাম্য মোড়লটিকে বাজিয়েও দেখা গেল মহৎ দর্শন বেঁচে আছে নিরাভরণ দরিদ্র সমাজেও।

এই স্কুল শিক্ষক, বিভূতির জ্ঞাতি ভাইটির নাম সুভাষ। এঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনিও কি ঝুমুর গান করেন?' তার উত্তরে তিনি সবিনয়ে বলেছিলেন, 'না না, এটা তো সকলের হবার নয়। আমাদের বংশের মধ্যে একমাত্র ও-ই ভগবানের

আশীর্বাদ পেয়েছে'। একজন শিক্ষিত রাজনীতি করা লোক, যিনি বিদ্যালয়ের শিক্ষকও বটে, তার মুখে নাচনি রাখা ভাই সম্বন্ধেও সাংগীতিক প্রতিভা স্বীকার যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ। একজন ঝুমুর গাইয়ের প্রতিভা ও সাধনা স্বীকারের মাধ্যমে ন াচনির স্থান ও তার মূল্যও পরোক্ষে নির্ণীত হয়ে যায়। আর এজন্যেই বিভূতির ঘরের বউ বিন্দুকে মেনে নেয় বাইরের বউ হিসাবে। বিন্দুডি গ্রামে গিয়ে মঞ্জুড়াকে দেখে সেদিন তাই মনে হয়েছিল, লক্ষ্মী কাকে বলে! কার মুখে মঞ্জুড়ার কথা শুনেছিলাম এখন মনে নেই। বাস রাস্তার ধারেই মঞ্জুড়ার ঘর। বাস থেকে নেমে দু-একজনকে জিজ্ঞেস করতেই তাঁরা এগিয়ে দিলেন। ভাঙা মাটির প্রাচীরে ঘেরা ছোট্ট মাটির ঘর, ছোট্ট উঠান, দু-একটি গাছ। মঞ্জুড়ার রসিক তথা স্বামী তখন তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে কোনো বিষয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আমাকে দেখে পরিচয় হতে খাটিয়া পেতে দিলেন ছোট্ট উঠোনে। বসলাম, জিজ্ঞেস করলাম, মঞ্জুড়া কোথায়? বললেন, কাছেই গেছে, আপনি বসুন, এক্ষুনি এসে পড়বে। অগত্যা রসিকের সঙ্গে শু হল আলাপ। তাঁর প্রথমা স্ত্রী গত হয়েছেন। প্রথম পক্ষের সন্তানও আছে। 'তাকেও দেখতে হবে, নাচ-গ ানটাও ভালবাসি, মঞ্জুড়া দু-দিকই সামাল দেয়।' রাস্তার দিকের সদর দরজা দিয়ে প্রবেশ করল মঞ্জুড়া। শ্যামবর্ণ, দীর্ঘাঙ্গি নী, পরনে লালপেড়ে সাদা শাড়ি। ব্লাউজ নেই। কাঁখে একটি বাচচা, মাথায় আটার ধামা। কপালে সিঁদুরের টিপ। প্রথমে বিশ্বাস হয়নি। এই মাতৃমূর্তি কীকরে নাচনি হয়!

দিবালোকের সেই মাটির মা রাতের উৎসবের আলোয় কীভাবে রঙ্গিলা নাচনিতে রূপান্তরিত হয় তার অনেকটাই সে অ ামাকে দেখিয়েছিল সেদিন সেই অপরারে আলোয়। আমাকে উঠোনের খাটিয়াতেই বসে অপেক্ষা করতে বলেছিল। দুধ ছাড়া চা আর বিড়ি টেনে টেনে অনেকটা সময় কাটল। হঠাৎই ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল সে। প্রায় চেনাই যায় না। এ কী সাজ! চুল বাঁধার স্টাইলেই বদলে গেছে আশি ভাগ। লালপেড়ে সাদা শাড়ি ছেড়ে পরেছে রঙিন চটকদার ঘাগরা আর ব্লাউজ। চোখে কাজল, ঠোটে রঙ আর অন্তরে অথই যৌবন। সব মিলে মঞ্জুড়া এক চমৎকার কণ নাগরী। স্বামীর জীবনের আশায় যে বেহুলা দেবসভায় নেচেছিল, এ যেন সেই বেহুলা। সাজ করে এসে আমার ক্যামেরার সামনে কয়েকট া পোজ দিল। ফটো তোলা হয়ে যাবার পর ঘরে ঢোকার মুখে ঘুরে তাকাল আমার দিকে। স্বামী, স্বামীর বন্ধুদের সামনে সে আমার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। এখন ঘুরে তাকানোর দৃষ্টিতে যেন একটা প্রশ্ন, কেমন দেখাচ্ছে আমাকে, তুমি বলো।

আমার চোখ কিছু বলতে পেরেছিল কিনা সেই জানে। সে তো, সেই মুহূর্তে সেদিন শুধু চেয়েছিল একটু মর্যাদা, স্বাতন্ত্র্য, সে শিল্পী। নাচনির সাজে তাকে যে বেশ রঙ্গিনী মনে হয় তা সে জানত। একজন বিদেশির কাছে আমার কাছে তাই একটু প্রশংসাই চেয়েছিল। শুধু চোখে-চোখেই রেখেছিলাম।

শালা ফটো উঠাছে

কত গ্রামে কত মেলায় কত নেতা মাতববর অনুরোধ করে জোর করে ফোটো তুলিয়েছে আমাকে দিয়ে। তাদের অনেকেই শুধু ফোটো তোলানোর আনন্দেই ফোটো তুলিয়েছে। অথচ সেই মানুষেরাই হঠাৎ আমাকে টুসু মিছিলের ফোটো তুলতে দেখে কেন খেপে গেল বোঝা যায়নি।

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে পশ্চিম সীমান্তে তুলিন। সুবর্ণারেখা নদীর সোনালি বালির চরে প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তিতে বসে তুলিন মেলা। সুবর্ণরেখাই এখানে বাংলা ও বিহারের সীমান্তে বিভাজন করেছে। ওপারে বিহার এপারে বাংলা, মাঝখানে হলুদ বালির বুক আঁকা ক্ষীণস্রোত স্বচ্ছ জলরেখা। কোথাও গভীরতা হাঁটু পরিমাণ, কোথাও বিঘৎখানেক, কোথাও প ায়ের পাতাও ডোবে না। সেই অল্প জলেই পৌষের ভোর থেকে শু হয় মকর স্নান। বঙ্গের তুলিন-পারে বসে মেলা। দূরে উত্তর পশ্চিম দক্ষিণ জুড়ে অনুচ্চ সব পাহাড়ের ছায়া মুরির ব্রীজের দিকে। বিহারে পড়েছে মুরি স্টেশন। ট্রেন চললে গুমগুম শব্দ আসে। মেলায় যা হচ্ছে তা হচ্ছে। শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্যের টানেই বার বার গেছি। ঝালদা, তুলিন, দেঁটগুগুই, বেগুনকোদর। সাইকেলেও ঘুরেছি।

তুলিনের মেলায় টুসু ভাসাতে আসে মেয়েরা। সকাল থেকেই আসে। টুসুর চৌডল নিয়ে আসে। কঞ্চি আর স লাঠি দিয়ে তৈরি কাঠামোর উপর রঙিন কাগজের বাহার। কত গড়ন, কত ছন্দ, কত রঙ, কত নকশা। গড়নে প্রথম দৃষ্টিপাতে মনে হবে জগন্নাথের রথ কাগজের ফুলে ফুলে ঢাকা। চৌডল তো রথেরই রকমফের। চতুর্দোলা। পালকি রথের চাকা থ াকে, চৌডলের থাকে না। স স লাঠির গোড়াগুলোর উপর ভর করেই দাঁড়িয়ে থাকে। এক হাত থেকে চার হাত পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। যার যেমন সামর্থ্য। সংক্রান্তির দু-তিন দিন আগে থেকেই বাজারগুলোতে বসে যায় চৌডলে মেলা। শত শত চৌডল এনে রাস্তার ধারে সাজিয়ে মেয়েদের চোখ টানতে ব্যস্ত সব চৌডল শিল্পীরা। যে যতভাবে পারে আকর্ষণীয় করে সাজাতে চেষ্টা করেছে চৌডলগুলোকে। সংক্রান্তির দিন সকাল থেকে মেয়েরা দলে দলে প্রতিমার মতো এক একটি চৌডল নিয়ে মিছিল বের করে। মিছিল নয়, শোভাযাত্রা। পরিপূর্ণ শোভাযাত্রা। মেয়েরা সকলেই পরে নতুন শাড়ি, জামা। ছেলে মেয়ে সকলেই নতুন পোষাক। তার সঙ্গে রঙ ঝলমল চৌডল। তার উপর গান। মেয়েরা টুসুরানীকে নিয়ে প্রচলিত সব ছোট ছোট গান সমবেত কণ্ঠে গাইতে গাইতে পথ চলবে। আর তাদের উপরে ঝরে পড়বে শীতের সকালের কমলা রঙের রোদ। এরকম শোভাযাত্রা পুলিয়া তথা গোটা মানভূম জুড়েই বের হয়। তুলিনে যেন বড্ড বাড়াবাড়ি । বহু দুর দুর ান্ত থেকে হেঁটে হেঁটে আসে চৌডলবাহী মেয়ের দল তুলিনে সুর্বণরেখার জলে তাদের টুসু ভাসাতে। ফলে বেলায় অর্থাৎ দশটা-এগারোটা নাগাদ বড় রাস্তায় ভিড় ঠাসাঠাসি হয়ে যায়। চৌডলে চৌডলে আলো হয়ে যায় সারা পথ। আর ব াজতে থাকে নারীকণ্ঠের গুঞ্জরিত টুসু গান। প্রাণের গান। পুষরাও সঙ্গে সঙ্গে থাকেন সাহায্য সহযোগিতার জন্য। বাড়তি জামাকাপড়, খাবারদাবারের পুঁটুঁলি, কিংবা কোলের ছেলে সঙ্গে সঙ্গে বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে পুষেরাও সঙ্গে সঙ্গে চলেন। প্রেমিকার সঙ্গে চোখাচোখি করতে করতে প্রেমিক চলেন। এরই সঙ্গে নেতারাও জনসংযোগ করার জন্য সাহায্য সহযোগিতার মূর্তি হয়ে শোভাযাত্রার পাশাপাশি চলেন। টাঙ্গি, বল্লম, নিদেন পাকা একটি লাঠি হাতে চলেন বলবান পুষেরা। তাঁদের স্মিত হাসি সকলকে বলে ভয় কী, আমি তো সঙ্গে আছি। সেবারে সদ্য ভোট যুদ্ধ সম্পন্ন হয়েছে। যুদ্ধজয়ী বামফ্রন্টের স্থানীয় নেতৃবৃন্দ তাই তাঁদের বিজয় উৎসবটিকে মিশিয়ে দিয়েছিলেন টুসু উৎসবের সঙ্গে। এর সহজ পদ্ধতি ছিল শোভাযাত্রাকারী মহিলাদের সামনে সামনে পার্টির ফেসটুন ব্যানার হাতে কর্মীদের ফিট করে দেওয়া। আগে কোথ াও এরকমটা হতে দেখিনি। তাই বেশ মজা লাগল। রাজনৈতিক দলের ব্যানার সামনে নিয়ে টুসুর চৌডলের শোভাযাত্রা চলেছে এর ফোটো রাখা দরকার। আমি ক্যামেরা তাক করে ফোকাস করতে লাগলাম।

হঠাৎ কানে এল একটা চিৎকার, মাতালের গলা, হেই শালা ফটো উঠাছে!
তারপরেই আর একটা মাতালের গলা, মার শালাকে।

আমি ভিউ ফাইন্ডার থেকে সরাবার আগেই অর্থাৎ কে বলছে কেন বলছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই টের পেলাম কেউ অ ামার চুলের মুঠি ধরে এক হেঁচ্কা টান দিল। কেউ আমার কাঁধের সাইড ব্যাগ ধরে টানল, কেউ ক্যামেরার স্ট্র্যাপটা টেনে ছিঁড়ে নিল। কেউ মুখে ঘুষি মারল, কেউ পিঠে কিল মারল। আমি প্রাণপণে ক্যামেরার বডি ও লেন্সটাকে চেপে ধরে বসে পড়লাম। তখন তারা আমার পিঠে বুকে দমাদম লাথি মারতে লাগল। কেউ কেউ আমার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলবার চেষ্টা করতে লাগল। আমি একবার উপর দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল দু-তিনটে টাঙ্গি আর বল্লমের ফলা শূন্যে নাচানাচি করছে। তখন ভয়ে দমবন্ধ হয়ে এল। মার অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারতাম, কিন্তু টাঙ্গির কোপে মুণ্ডু ধড় থেকে আলাদা হয়ে গেলে আর বাঁচা যায় না, অথবা বল্লমের ফলা যদি বুকের ভিতর ঢুকে যায় তাহলেও অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাবে। বলাবাহুল্য চিৎকার চেঁচামেচি সমানে চলছে, যার কিছুই আমার কানে ঢুকছিল না।

এমনই সময় চোখে পড়ল প্যান্ট আর টি-শার্ট পরিহিত দুজন বলবান যুবক সেই আত্রমণকারী জনতাকে সবলে কনুই অ ার হাঁটু দিয়ে গুঁতিয়ে সরাচ্ছে, রোগাপট্কা দু-একজনকে তো প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর তারা আমাকে তুলে ধরে একটা ফাঁকা দিকে ছুটতে লাগল। বেশ কিছুটা রাস্তা প্রায় চ্যাংদোলা করে আমাকে তারা আনল, তারপর আরও ঠেলে দিয়ে বলল, যান এদিকে ছুটুন। বাজারের দিকে চলে যান। বলা বাহুল্য ছুটতে ছুটতে আমি এসে এক সময় তুলিন বাজারে

এসে পৌঁছলাম।

মিনিট পনের পরে আমার বন্ধু তথা স্থানীয় গাইড ধীনের মাহাতো তার দলবলসহ এসে পৌঁছাল। কোথায় কোথায় লেগেছে সবাই জানতে চাইল। ধীরেনের দুচোখ রাগে লাল হয়ে আছে। ও স্বল্পবাক মানুষ। তাই ওর চোখমুখেই ওর মনের ভাবটা বেশি ফোটে। বুঝতে পারছিলাম, তখনও পর্যন্ত ও আমার প্রাণ বাঁচাতে পেরেছে এই পর্যন্ত ভাবনাতেই ঘুরপাক খাচ্ছে। ক্যামেরাটা আমার হাতে, স্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে ঝুলছে। সাইডব্যাগ থেকে সোয়েটার, মাফলার কেউ তুলে নিয়েছে।

ওরা বলল, 'সার এখন আপনি পুল্যা চলে যান। পরে আমরা দেখা করব।' আমার মুখে কোন কথা ছিল না। একটা বাস এসে থামা মাত্র আমি উঠে পড়লাম।

মাঠা বুর মাথায়
পুলিয়া শহর থেকে তো বটেই; জেলার গোটা পুব দিকটা থেকেই অযোধ্যা পাহাড়ের চুড়ো দেখা যায়। এই চুড়োর দক্ষিণে মাঠা বু। ফলে রেলপথে বরাবাজার স্টেশনে নেমে বলরামপুর হয়ে মাঠা পাহাড়ের তলায় যেতে হয়। বাস রাস্তা ম াঠা পেরিয়ে বাঘমুণ্ডি, চড়িদা হয়ে চলে গেছে ঝালদা পুর্যন্ত, পুরো অযোধ্যা পাহাড়টাকে বেড় করে। তবে মাঠা মাধুর্য এতই মনোরম যে, এখানে নেমে পড়তে মন চাইবে।

পাহাড়টা এখানে খুব দ্রুত খাড়া হয়ে গেছে। নীচে বড়ো শাল সেগুন মহুয়া কুসুম গামার আর বর্তমানের আবাদি গাছের জঙ্গল। পুরনো শালগাছগুলির নীচে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের মাথা দেখতে গেলে ঘাড় উল্টিয়ে মুখ হাঁ করে উপর দিকে তাক াতে হয়। অতটা না করলেও ক্ষতি নেই, কারণ পাহাড়ের গা এখানে খুবই কাকার্যময়। বহু দুর থেকে দেখলে যা শুধু মেঘের মত ঘন শ্যাম শোভার জমাট নকশা, এখানে থেকে সেটা নানান বর্ণচ্ছটায় রচিত এক দুর্দান্ত তেল রঙের ক্যানভ াস। জলরঙে বা টেম্পারায় এ নিসর্গ দেখতে হলে ইন্দ্র দুগারকে মিউজিয়াম থেকে নামাতে হবে। শীতের বেলাতেও সবুজ ফুটেছে মোটা বুনোটের কার্পেটের মতো, মাঝে মাঝে নেড়া পাথরের উজ্জ্বল সাদা, গোলাপি, ধূসর, তামাটে সব রঙের পেট। সবার শেষে শীতের ছোঁয়ায় গাছের পাতারা ইচ্ছে করে ছড়িয়ে দিচ্ছে হলুদ, কমলা, কালচে, জলপাই রঙের পাত া। আর ইউক্যালিপটাসের সাদা সাদা গুঁড়িগুলো দাঁড়িয়ে আছে যেন ন্যাংটো সাহেবদের কাণ্ডকারখানা।

এ পথে বাসের সংখ্যা খুবই কম। দিনে পাঁচ-ছটির বেশি বাস চলে না তখন। উৎসবের দিনে মানুষ এতই মাতোয়ারা থ াকেন যে, ভাড়া দেওয়া তো দূরে, উল্টে বাস কন্ডাক্টারকে দু-চারটে থাপ্পড় দিতে পারলে মনে আনন্দ হয়। তাই উৎসবের দিনে বেশি মানুষের জন্য বেশি বাস চালানোর বদলে বাস উধাও। মানুষ তাই মাইলের পর মাইল পায়ে হাঁটে। গাইতে গাইতে হাঁটে। হাতে থাকে শোভা, কোনো গাছের একটুকরো ডাল। মহুয়া, শাল, সেগুনের পারা সহ এক টুকরো ডাল ভেঙে হাতে নিয়ে হাঁটতে ভালবাসে মানুষ। বিশেষ করে মেয়েরা। তারা তেল মেখে চকচকে হয়ে টানটান শাড়ি পরে খোঁপ া বেঁধে খোঁপায় ফুল বা পাতা গুঁজে রূপসী হয়। গলায় ঝরে গান। এক হাতে গাছের পাতা আরেক হাত সখীর কাঁধে, হ াসতে হাসতে গাইতে গাইতে চলে পথ। হঠাৎ পিছন থেকে যদি কোনো বাস বা অন্য গাড়ি ওদের জন্য না থেমে দ্রুত এসে দ্রুত চলে যায় তো ওরা কুলকুলি দেয়। কুলকুলি হল হাসির ফোয়ারা। অপার আনন্দ।

ছেলেরা ভালবাসে প্যান্ট শার্ট পরতে। ঘাড়ে রঙিন মাল দেয়, অথবা গামছা। মাথায় টুপি, চোখে কালো চশমা, মুখে সাদ া সিগরেট। নায়কের চেহারা। উৎসাহী যুবকেরা গান গায়। অত্যুৎসাহী যুবকেরা সাইকেলের হাতলে মাইক বেঁধে মাইক্রে াফোনে মুখ রেখে পেমের গান গাইতে গাইতে চলে। তাদের হাতেও কোন গাছের পাতার শোভা, রঙিন গামছা বা মাল ন াড়ানোর শোভা। শোভাযাত্রা করে পয়লা মাঘের দুপুরে এসে মেলা জমাচ্ছে সবাই মাঠা পাহাড়ের তলায়, শাল পিয়

ালের জঙ্গলে। ফিরতে রাত হবে। পথে আছে নানা রকম বিপদ, তাই অনেকের হাতেই লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি। যেহেতু উৎসবের লগ্ন তাই এখন গলায় ঝুলছে মাদল, কারো হাতে 'কেন্দ্রী' নামের হাতে তৈরি বেহালা। দল জুটে গেলেই শু হয়ে যাবে গানের আসর। নীচের আসর। কোন্ গ্রাম থেকে কোন্ দল এসে কোথায় কোন্ গাছের তলায় নাচের কিংবা গ ানের আসর জুড়ে দিচ্ছে তার কোনো ঠিকঠিকানা নেই। এটা মেলা। তুমিও এসেছে আমিও এসেছি। তুমিও গাইছ আ মিও গাইছি। তুমি ওদিকটায় গাও, আমি এদিকটায় গাই। ক্লান্তি এলে মাটিতে বসে তেলেভাজা সহযোগ পান কর মহুয় ার মদ। খাও জিলাবি, লাডডু, লং, কালাকাঁদ, নিখুঁতি যা ইচ্ছা। কিছু না খেয়ে শুধু মহুয়ার রসে মাতাল হয়ে সারারাত গাছতলায় শুয়ে পড়ে থাক, তাও ভাল। এটা তো উৎসবের লগ্ন। এখন শুধু আনন্দ। মন যা চায় তা করাতেই আনন্দ। যেন সব শিশুর দল, মেতেছে প্রকৃতির পুজো খেলায়।

পাহাড়ের নীচে শাল পলাশ মহুয়ার জঙ্গলে এই হাসি খেলা মিলন-মেলা চললেও মাঠা বুর পুজো কিন্তু উপরে পাহাড়ের মাথায়। ও তথ্য আমার জানা ছিল আগেই। সেই পুজোর প্রধান অর্থাৎ পুরোহিত হরদত্ত সিং ঠাকুর। আমি আজ তাঁর সঙ্গে দেখা করব। ঐ পাহাড়ের মাথায় উঠে পূজাস্থলে গিয়ে।

সেখানে যাওয়া যায়। অনেকেই যাচ্ছেন। মেয়েরাও যাচ্ছেন। কিন্তু সকলেই কম বয়সী। তণ। কারণ পথটা দুর্গম, খাড়াই। স পায়ে চলা পথ। শাল পিয়াল মহুলে সাজানো পথ। অনেক অচেনা লতা আর জংলা গাছে ঠাসা, চাপা পড়া পথ। চলতে চলতে বোঝা যাচ্ছিল অপেক্ষাকৃত বড় বড় চাঁই পাথর টেনে এনে সাজিয়ে সিড়িঁর ধাপের মত করা হয়েছে। সর্বত্র তা সম্ভব হয়নি, তাই কোথাও কোথাও এক ধাপ থেকে আরেকটা ধাপের উচচতা অনেকটা,বেশ জোর দিয়ে উঠতে হয়। এভাবে তৈরী পথটা সারা বছরই দুপাশ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া ঝোপঝাড়ে বন্ধ থাকে। বোঝা যাচ্ছিল পয়লা মাঘের পুজে ার জন্যেই ডালপালা কেটে সরিয়ে সদ্য পথটা চলাচলের উপযোগী করা হয়েছে।

আমি যখন উঠছি , মাঝপথে জানলাম পুজো শেষ হয়ে গেছে , এবার সকলের নামার পালা। কারণ ততক্ষণে লক্ষ্য পড়েছে ওঠার থেকে নামার লোকই বেশী। উপর দিকে তাকিয়ে দেখি কাতারে কাতারে ছেলে মেয়েরা এবার উপর থেকে নামছে। ওঠার চেয়ে নামার গতি হয় বেশী। তাই বুঝি আনন্দটাও বেশী। ছেলেমেয়েদের মধ্যে চলছে ঠাট্টা-তামাশা, রঙ্গ রসিকতা, শরীরে শরীরে ধাক্কাধাক্কি। ছেলে-ছেলেতে ধাক্কাধাক্কি, ছেলে-মেয়েতে ধাক্কাধাক্কি। আমুদে ছেলেরা ইচ্ছে করে পা হড়কানোর অভিনয় করে মেয়েদের ঘাড়ে পড়ছে এবং বন্ধুদের বাহবা পাচ্ছে। এতে সেই মেয়েরা যে খুব একটা বিরক্ত হচ্ছে তা নয়। আজ যৌবন যেন উপভোগ করার জন্যেই। যৌবন যেন বিলিয়ে দেবার জন্যেই। তাই কেবলই হাসি আর গ ান। মাঠা বুর মাথায় সকাল থেকে শু হয় পুজো। দেবদেবীর মূর্তি কিছু নেই। এই শীর্ষদেশে যে খানিকটা সমতল ভূমি দেখ া যাচ্ছে তারও মধ্যে বিশাল বিশাল পাথরের স্তূপ। সেসবের মধ্যেও বড় বড় গাছ। একেবারে দক্ষিণে বিস্তৃত রয়েছে একটি প্রস্তরখন্ড। আনুমানিক দু'শ বর্গফুটের মত নিরেট পাথরের মেঝে। সেই পাথরের উপরেই পুজোর আয়োজন। পাথরটির পরেই দক্ষিণে ধূ ধূ শূণ্য। না পাহাড়, না প্রান্তর , না কোনো জঙ্গল। শুধু শূণ্যতা। আকাশ। দূরে হালকা নীলাভ রঙ্গে দিগন্তের আভাস।

আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই পুজো শেষ হয়ে গিয়েছিল। তখন চলছে সব উপকরণ সাজসরঞ্জাম গুছিয়ে নেমে যাবার আয়োজন। হরদত্ত সিং ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে চোখো চোখি হতেই তিনি দু-হাত তুলে নমস্কার জানালেন। হাসলেন। প্রতি-নমস্কার জানিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম। খালি পায়ে কোরা ধুতি পরা সহাস্য মূর্তি প্রৌঢ় হরদত্ত সিং ঠাকুর সত্যিই এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারী পাতলা চেহারা। ধুতির প্রান্ত গলায় জড়ানো। গোঁফ দাড়ি কামানো মুখ, টিকালো নাক। কপালে হোমভস্মের টিপ। এই চরিত্রে অভিনয় করতে হলে বসন্ত চৌধুরীকে আরও রোগা হতে হবে। সকলে তাকে ঠাকুর বলেই সম্বোধন করে। তিনি স্বয়ং মঠা সিং-এর বংশধর বলে পরিচিত। অত্যন্ত বিনয়ী ভদ্র। সেই শেষ মুহূর্তেও দৈবস্থ ান ও দেবকর্ম পদ্ধতিসমূহের যতটুকু আমার দেখা হল তাতেই বুঝলাম, সমগ্র বিষয়টির প্রতি এমন একটা সরল বিশ্বাস ও

প্রত্যয় আছে যা সচরাচর পূজারী পুরোহিতদের মধ্যে দেখা যায় না। এই প্রত্যয় কি পাঁচশত বছরের প্রাচীন পূর্বপুষ মঠা সিং-এর রক্ত শিরায় ধারণ করার প্রত্যয়? যুগে যুগে বহু শত্রু দমনকারী প্রজাপালনকারী রাজরক্তের প্রত্যয়? যে রক্তের গরিমা নিকটস্থ কাশীপুর রাজাকেও খাজনা দেয়নি, ইঁচাগড়ের রাজাকেও দেয়নি। হার মানতে হয়েছিল ব্রিটিশের কাছে। বন্দুক-রাইফেলের কাছে টাঙ্গি তরোয়াল আর চিরাচরিত তির-ধনুক পরাভব স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু তাতে সিং ঠাকুরের রক্তের মান যায়নি।

সেই সিং ঠাকুরের রক্ত শরীরে বইছে। তাই এতখানি আত্ম প্রত্যয়। হরদত্ত সিং ঠাকুর গলবস্ত্র হয়ে বলির রক্তে পায়ের প াতা ডুবিয়ে শূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন এই পাহাড়ে চূড়ায়। তাঁর পায়ে কাছে পাথরের উপর তখনো রাখা আছে বংশের প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক বিশাল এক তরবারি। প্রজার জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য ব্যবহার হত এই তরবারি। তরবারির পাশে বলি দেওয়ার জন্য একটা ধারালো টাঙ্গি। তার পাশে ফুল-পাতার মধ্যে দুটি পাঁঠার মুন্ডু। কল্পনা করতে হবে ওইখানে অতীতে থাকত পাঁঠার বদলে মানুষের মুন্ডু। নরবলির প্রথা নাকি এখানেও ছিল।

পাঁচ'শ বছরের পদচারণার জন্যেই হোক কিংবা প্রকৃতির খেয়ালেই হোক পূজাস্থলটি ঈষৎ গভীরতা পেয়েছে, অনেকটা চ্যাপটা সরার মতো হয়ে গেছে। প্রায় দশফুট ব্যাসের সেই অবতল শিখাখণ্ডে জমে উঠেছে রক্ত, মাঝখানটায় পা দিলে প ায়ের গাঁট ডুবে যাবে। হরদত্ত সিং ঠাকুরের অন্যান্য বংশধরবা তাঁকে সহযোগিতা করছেন। তাঁদের ঘোরাফেরার ফলে শুকিয়ে আসা আঠালো রক্তের চটচট শব্দ উঠছে। চলাচলে অসুবিধাও হচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। সমস্ত পূজাস্থলটিই শত শত বলির রক্তে রক্তময় হয়ে আছে। যাঁরা বলি উৎসর্গ করেছেন তাঁরা ধড়টি নিয়ে গেছেন মুণ্ডটি জমা আছে। এইসব দেওয়া নেওয়ার সময়েও চতুর্দিকে বিস্তর রক্ত ছড়িয়েছে। সংগৃহীত পাঁঠার মুন্ডুগুলি ছোটো ছোটো বস্তায় ভরে ফেলা হচ্ছে।

বিধিমত প্রতিটি মানুষ ও প্রাণীকে পূজাস্থল থেকে নির্বিঘ্নে নামিয়ে দিয়ে সকলের শেষে হরদত্ত নামবেন এবং তা সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসার আগেই । অন্ধকার নামার সঙ্গে সঙ্গেই নাকি স্বয়ং মঠা সিং আসবেন বলির রক্ত পান করতে। বাঘ তাঁর ব াহন। সে সময় এখানে কারো উপস্থিত থাকা নিরাপদ নয়। বলাবাহুল্য যে, এত পাঁঠা বলি রক্তের ঘ্রাণ কি তাদের নাকে পৌছয়নি? অন্ধকার কেন, আলো থাকতেই তাদের এসে ঝাঁপিয়ে পড়ার কথা। নেহাত এতগুলো মানুষ এখনো একত্র হয়ে আছে, তাই তারা এগোতে সাহস পাচ্ছে না। প্রশ্ন হল, এখনই এসে পড়লে এই দু-দশ গ্যালন রক্ত চেটে আর দুটি মাত্র পঁ াঠার মুণ্ড চিবিয়ে তারা সন্তুষ্ট হবে কি না। অতএব যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এখান থেকে নেমে পড়াই ভাল।

সৃষ্টিসন্ধান

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com